Jagannath University Journal of Arts, Vol. 9, No. 2, July–December 2019
ISSN 2519-5816

ইসলাম ও মুসলিম নৌবাহিনী

সুফিয়া খাতুন*

Abstracts: The rise and growth of Islam has been regarded as one of the most important events of the world history. Prophet Muhammad (570-632 A.D) was the founder of Islam. Islam Inspired a warlike spirit and national consciousness among the Arabs who decided to spread their new religion and carry on military conquest all over the world. Within less than a century, the Arabs established a vast empire which extended from the Atlantic Sea in the west to the banks of the river Indus in the east and, from the Caspians Sea in the north to the vally of the river Nile in the south. Muawiyah was the builders of the Muslim navy. It was a main power of the Muslim world. They were able to defend themselves from any enemy threat. They attacked many islands of Africa, Sicily Crete, Cyprus and conquest its. Besides the Muslim navy conqure many island, they control for a long peroid and certainly not under Byzantine rule as such. They attacked and conquest in the waters of the Mediterrranean Sea and the Marmara Sea. The Muslim navy was a major power of the Muslim era. The aim of the article was to achieve of the Muslims navy, it also identyfied the establishment of muslim navy, types of wars, rebellions, their recruitment, structure, organization, ships, armament, arsenal, weapon, technology and tactics of attack.

ভূমিকা

ইসলাম ধর্মের সম্প্রসারণ ও মুসলিমদের রাজ্য বিস্তার বিশ্বইতিহাসে এক ঐতিহাসিক ও চমকপ্রদ ঘটনা। ইসলাম ধর্ম যতো দ্রুত বিস্তার লাভ করেছিল, পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্ম এতো দ্রুত বিস্তার লাভ করতে পারেনি। ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জন্মের পর অশান্ত আরবের বুকে শান্তির ধর্ম ইসলাম প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হয়। তিনিই প্রথম শান্তি সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরবর্তীতে তাঁরই প্রচেষ্টায় ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদীনা সনদের মাধ্যমে সমগ্র আরবে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মৃত্যুর পর খোলাফায়ে রাশেদীনের খলিফাগণ আরবভূমিকে এক যাদুর ভূমিতে পরিণত করে। তাদের মতো বীর পুরুষদের আবির্ভাব পৃথিবীতে খুব কম হয়েছে। ইসলাম ধর্ম আরবের বাইরে যেসব সাহসী বীরপুরুষ দ্বারা বিস্তার লাভ করেছিল তারা হলেন- খালিদ বিন ওয়ালিদ, আবু উবায়দা, আমর ইবন আল-আস, সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস, ওকবা বিন নাফি প্রমূখ ব্যক্তিগণের দক্ষতায়। তারা আফ্রিকা, সিরিয়া, মিশর, ইরান, ইরাক বিজয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মৃত্যুর ৮০ বছরের মধ্যেই এশিয়ার সিন্ধু থেকে ইউরোপের স্পেন পর্যন্ত মুসলিম রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটে। মূলত, মুসলিমদের

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ

ধর্ম প্রচারই আরবের বাইরে রাজ্য বিস্তারে মূল অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। এছাড়া সৈনিকদের মনে শাহাদৎ বরণের আকাঙ্ক্ষা ছিল। ইসলামী সাম্রাজ্য বিস্তারে মুসলিম নৌবাহিনীর ভূমিকাও অনবদ্য। মুসলিমগণ বিধর্মী অধিকৃত এলাকা দখল করলে ইসলামের উদারনৈতিক মনোভাবে মুগ্ধ হয়ে অনেক নিম্নশ্রেণির লোক ইসলাম গ্রহণ করে। এছাড়া মুসলিম বিজেতাগণ বন্দীদের সাথে কখনও খারাপ ব্যবহার না করার তারা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। যা ইসলাম ধর্ম বিস্তারে আরো বেশি সহায়তা করে। আরব নৌ বাহিনী ভূ-মধ্যসাগর ও বিভিন্ন উপসাগরীয় এলাকা দখল করলে শত্রুপক্ষের অনেক নৌ অফিসার, ইঞ্জিনিয়ার, সেনাপতি ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পী বন্দী হয়। এসব বন্দীর সাথে শর্ত থাকতো এবং তারা তাদের নৌ বাহিনীর আক্রমণের বিভিন্ন কৌশল মুসলিমদের জানাতো। এছাড়া বন্দী বিভিন্ন শিল্পী বিশেষ করে জাহাজ নির্মাণ শিল্পী ও কারিগরগণ মুসলিম কারিগরদের অত্যাধুনিক জাহাজ নির্মাণ ও প্রযুক্তির ব্যবহার শিখিয়ে দিতো। বন্দীদের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে মুসলিমরা নৌবাহিনীকে আরো বেশি আধুনিক করে গড়ে তোলে। খোলাফায়ে রাশেদীনের চারজন খলিফার রাজত্বকালে উন্নত সেনাবাহিনী থাকলেও নৌবাহিনী ছিলনা। কিন্তু উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়া প্রথম নৌবাহিনী গঠন করে সাইপ্রাস দ্বীপে অভিযান প্রেরণ করেন এবং প্রথম অভিযানেই সাফল্য লাভ করেন। ফলে তিনি এই বাহিনীকে আরো বৃদ্ধি করেন। তার পরবর্তী খলিফাগণও একই নীতি অনুসরণ করেন। তবে খলিফা আব্দুল মালিক নৌবাহিনীকে আরো অত্যাধুনিক করে তা পুনঃগঠিত করেন। আব্বসীয় খলিফা আল মামুন নৌ বাহিনীকে গুরুত্ব দেন এবং এই সময় সাকালিয়া পুনরায় বিজিত হয়। ফলে সমগ্র জলসীমা মুসলিম শাসনাধীনে চলে আসে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, গোত্রীয় যুদ্ধে নৌবহরের সুযোগ না থাকলেও আরবরা নৌযানবিদ্যায় পারদর্শী ছিল, আল কুরআনের বর্ণনা তারই প্রমাণ। এছাড়া প্রাক মুসলিম যুগ থেকেই বণিকরা সমুদ্রগামী নৌযানে বাণিজ্য করত।

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণা পদ্ধতি যে কোনো গবেষণার মৌলিক বিষয়। প্রবন্ধটি একটি মৌলিক গবেষণা। খোলাফায়ে রাশেদীনের সময় থেকে নৌবাহিনী প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয় সে বিষযটি আমরা সবাই অবগত কিন্তু বহু বছর পূর্বেই আল কুরআন-এ নৌযান সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। খোলাফায়ে রাশেদীনের পর উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনামলে নৌবাহিনীর বিকাশ ঘটে। এবং সমগ্র জলপথে তারা আধিপত্য বজায় রাখে। এ প্রবন্ধটি রচনায় মৌলিক উৎস হিসেবে আল কুরআনের বিভিন্ন সূরার আয়াত এর অর্থ ব্যবহার করা হয়েছে। দ্বৈতায়িক উৎস হিসেবে সমসাময়িক নৌবাহিনী সম্পর্কিত বিভিন্ন গ্রন্থ এবং অন্যান্য গবেষকদের গবেষণামূলক গ্রন্থের সহায়তার আলোকে ইতিহাস গবেষণার বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণধর্মী পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

প্রতিটি রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হচ্ছে নৌবাহিনী। যে রাষ্ট্রের নৌবাহিনী যত উন্নত ও শক্তিশালী সেই রাষ্ট্র ততবেশি আয়তনের অধিকারী ও শক্তিশালী। মূলত জলসীমা নিয়ন্ত্রণে রাখার মাধ্যমেই রাষ্ট্রের আয়তন কম বা বেশি হয়ে থাকে। এই জলসীমা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য নৌবাহিনীর ভূমিকা অপরিসীম। পবিত্র শান্তির ধর্ম ইসলাম এর সম্প্রসারণে নৌবাহিনী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। আল কুরআনে মহান আল্লাহতায়ালা নদী, সমুদ্রসীমা সম্পর্কে অনেক আয়াত নাজিল করেছেন। উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনামলে মুসলিম সেনাবাহিনী দ্বারা অনেক সমুদ্রসীমা বিজিত হয়েছে এবং ইসলামের সম্প্রসারণ ঘটেছে। জলসীমার নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষার জন্য নৌবাহিনীর বিকল্প

নেই। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থে বিচ্ছিন্নভাবে আলোচিত। এছাড়াও কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু সেখানে পবিত্র কুরআনের নৌবাহিনী সম্পর্কিত আয়াতগুলো সন্নিবেশিত হয়নি। তাই অনালোচিত বিষয়টিকে উপস্থাপন করাই এই প্রবন্ধ রচনার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

গবেষণার গুরুত্ব

মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের ৩০ পারার ১১৪টি সূরার মধ্যে ১২ টিরও অধিক সূরায় জলসীমা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। বর্তমান কালের সমুদ্র ও জলসীমা সম্পর্কে যে চৌদ্দশত বছর পূর্বে আল কুরআনে আলোচিত হয়েছে তা আমরা অনেকেই অবহিত নই। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সময়ে সমুদ্রসীমা মুসলিম শাসনাধীনে ছিল না। খোলাফায়ে রাশেদীনের ২য় খলিফা হযরত ওমরের শাসনামলে মুসলিম সাম্রাজ্য সবচেয়ে বেশি বিজিত হয় কিন্তু সমুদ্রসীমা বিজিত হয়নি। উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়া প্রথম নৌবাহিনী প্রতিষ্ঠা করেন এবং নৌ অভিযান পরিচালনা করে সফল হন। পরবর্তী শাসকগণ এই বাহিনীকে আরো বেশি সম্প্রসারিত করেন। শাসকগণ নতুন নতুন নৌঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত করেন, অস্ত্রাগার, নৌজাহাজ তৈরি করেন। এবং মুসলিমগণ ভূমধ্যসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর তাদের নিয়ন্ত্রণে আনেন। অর্থাৎ মুসলিম নৌবাহিনী সমগ্র জলসীমা নিজেদের দখলে রাখতে সক্ষম হয়। সমগ্র বাণিজ্য তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং বাণিজ্য শুল্ক আদায়ের মাধ্যমে তারা অর্থনৈতিক শক্তির অধিকারী হয়। এই প্রবন্ধে আল কুরআনে উল্লেখিত সমুদ্র, জলসীমার বর্ণনা ও মুসলিমদের জলসীমায় একাধিপত্যের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। এই সূত্রে প্রবন্ধটির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত

ইসলামী সভ্যতার জন্মভূমি আরব দেশে কোনো নদী ছিল না। যে সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর অস্তিত্ব ছিল সেগুলো ছিল শুধুমাত্র মাটির উর্বরতা রক্ষার জন্য। যেখানে বৃষ্টিপাত খুবই অপর্যাপ্ত। লোহিত সাগরের পূর্ব উপকূল থেকে ৫০ মাইল দূরে মক্কা নগরী। এই নগরীতেই কুরাইশ বংশে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জন্মগ্রহণ করেন। মহান আল্লাহ জীবরাইল (আঃ) এর মাধ্যমে মুহাম্মদ (সাঃ) উপর কুরআন নাজিল করেন। কুরআন নাজিলের সাথে সাথে ইসলামী সভ্যতার যাত্রা শুরু হয়। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মাধ্যমে মক্কা ও মদীনায় ইসলামী সভ্যতার সম্প্রসারণ হলেও খোলাফায়ে রাশেদীনের চার জন খলিফার মাধ্যমে আরবের বাইরে ইসলামী সভ্যতার সম্প্রসারণ হয়। যেখানে মূল নিয়ামক হিসেবে কাজ করে সামরিক বাহিনী। খলিফাদের সিদ্ধান্তে কার্য পরিচালনা করে থাকে সেনা সদস্যরা। প্রতিটি সামরিক বাহিনীতে স্থল বাহিনী (পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী) ও নৌবাহিনী কাজ করতো। প্রথম দিকে সেনা বাহিনী গঠিত হতো নিজ নিজ গোত্রীয় পুরুষদের নিয়ে। এই বাহিনীর বেতন দেয়া হতো ভূমি রাজস্ব ও অন্যান্য উৎস কর থেকে। প্রথম দিকে খলিফা শুধু প্রধান সেনাপতিকে নিয়োগ দিতেন, আর অন্যান্য সদস্য নিয়োগের দায়িত্ব ছিল সেনা প্রধানের। খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) সময় থেকেই স্থায়ী সেনানিবাস স্থাপিত হয়।[১] এই সময় যেসব অঞ্চল বিজিত হয় বা যেখানে ইসলামের সম্প্রসারণ হতো সেখানেই সেনাবাহিনীর স্থায়ী সেনানিবাস গঠিত হয়। যেমন- বসরা (ইরাক), কুফা, ফুসতাত (মিশর), কায়রোয়ান (আফ্রিকার), মানসুরা (সিন্ধু), গাজা, এডেসা, ইস্পাহান, আলেকজান্দ্রিয়ায়[২] প্রভৃতি স্থানে ইসলামের পতাকা উড্ডীয়ন হয়েছিল। যুদ্ধে নৌবহর ব্যবহার না করলেও নৌবিদ্যায় যে প্রাক মুসলিম যুগের নৌবাহিনীর ধারণা আরব সমাজে ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় পবিত্র আল কুরআনের আয়াত দ্বারা। খোলাফায়ে রাশেদীনের সময় থেকেই সমুদ্রগামী জাহাজে ব্যবসায় বাণিজ্য চলত।

আল কুরআন-এ নৌযান

বিশ্বের প্রথম জাহাজ হযরত নূহ (আঃ) এর তৈরি কিশতি। পবিত্র কুরআনের ১২ পারায় সুরা হুদ-এ উল্লেখ রয়েছে যে, আর তুমি আমার তত্ত্বাবধানে একখানা জাহাজ নির্মাণ করা শুরু করে দাও।[৩] এছাড়া ২৭ পারার সুরা কামার-এ উল্লেখ রয়েছে যে, এবং তাঁকে আরোহণ করালাম তখতা ও কীলক নির্মিত ওপর।[৪] তখন তাদের সকলকে নিয়ে জাহাজটি ভেসে চললো পর্বত পরিমাণ তরঙ্গের মধ্য দিয়ে।[৫] এবং তার নিদর্শনগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে সমুদ্রে বহমান পর্বত পরিমাণ জাহাজগুলো। ইচ্ছা করলে তিনি বাতাসকে স্থির করে দিতে পারতেন। তখন জাহাজগুলো অচল হয়ে দাঁড়াবে পানির উপর। নিশ্চয়ই এতে বহু নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক ধৈর্যশীল ও শুকরগুযার মানুষের জন্যে।[৬] তুমি কি দেখো না যে, আল্লাহ যমীনের সব কিছুকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন এবং নৌযানগুলো তারই হুকুমে সাগরে সন্তরণ করে থাকে।[৭] এবং তিনি (আল্লাহ) নৌযানগুলোকে তোমাদের মঙ্গলের জন্য বশীভূত করেছেন। যাতে সেগুলো তাঁরই নির্দেশক্রমে নদনদীতে ভেসে বেড়াতে পারে আর ঐসব নদনদীও তিনি তোমাদের মঙ্গলের জন্যে বশীভূত করে দিয়েছেন।[৮] অথবা গভীর সমুদ্রে অন্ধকাররাশির ন্যায় যাতে তরঙ্গের ওপরে তরঙ্গ সমাচ্ছন্ন, তদুপরি মেঘমালা বিদ্যমান, পরস্পরের ওপর পরস্পর অন্ধকাররাশি ঘনীভূত ; যখন সে স্বীয় হস্ত প্রসারিত করে, তখন সে তা দেখতেও পায়না এবং আল্লাহ যাকে জ্যোতি দান করেন না ফলত তার জন্যে জ্যোতিই নেই।[৯] অনন্তর যখন তারা নৌযানে আরোহণ করে, তখন তারা আল্লাহকে তাঁরই উদ্দেশ্যে বিনত হয়ে অকপটভাবে আহবান করে। অনন্তর যখন তিনি তাদেরকে ভূমির দিকে উদ্ধার করেন, তখনই তারা আল্লাহর অংশী স্থির করে থাকে।[১০] জিজ্ঞাসা করো, স্থলভাগ ও সাগরতলের বিপদপুঞ্জ থেকে কে তোমাদেরকে রক্ষা করে থাকে? যখন তোমরা তাঁর নিকট প্রার্থনা করে থাকো গোপনে ও কাকুতি মিনতি করে? আর বলতে থাকো যে, তিনি যদি আমাদের এ বিপদ থেকে উদ্ধার করেন, তাহলে আমরা নিশ্চয় তাঁর শুকরগুজার হয়ে থাকবো। বলো আল্লাহই তোমাদেরকে এ বিপদ থেকে এবং অন্যান্য সমস্ত আপদ থেকেই রক্ষা করে থাকেন। কিন্তু তবু তোমরা তাঁর সাথে শিকর করে থাকো।[১১] একই সুরায় উল্লেখ রয়েছে যে, এবং তিনিই (আল্লাহ) তোমাদের জন্যে নক্ষত্রপুঞ্জ সৃষ্টি করেছেন যেনো এ দ্বারা তোমরা ভূ-তল ও সমুদ্রের অন্ধকারে পথপ্রাপ্ত হও। নিশ্চয়ই আমি অভিজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্যে নির্দশনাবলী স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছি।[১২] সুরা রূম এ উল্লেখ রয়েছে যে, এবং এটাও তাঁর অন্যতম নিদর্শন যে, তিনি সুসংবাদবাহী সমীরণ প্রেরণ করেন এবং যেনো তিনি তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহের কিয়দাংশ আস্বাদন করান এবং যেনো তাঁর আদেশে নৌযানগুলো পরিচালিত হয় এবং যেনো তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করো এবং যেনো তোমরা কৃতজ্ঞ হও।[১৩] সুরা ইয়াসীন এর ৪১ নং আয়াতে উল্লেখ রয়েছে যে, এবং তাদের জন্য এটাও এক নিদর্শন যে, আমি তাদের বংশধরগণকে পরিপূর্ণ তরণীতে আরোহণ করিয়েছিলাম। এবং আমি তাদের জন্যে এরূপ আরো অনেক জিনিস সৃষ্টি করেছি, যাতে তারা আরোহণ করতে থাকে। এবং আমি যদি ইচ্ছা করি তাদেরকে নিমজ্জিত করে দিতে পারি। অতঃপর তাদের জন্য কোনো উদ্ধারকারী হবে না এবং তারা কেউই পরিত্রাণ পাবে না। কিন্তু আমার নিকট হতেই অনুগ্রহ এবং এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্তই ভোগ সম্পদ।[১৪] আল্লাহ তায়ালা নৌযানের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, তোমরা কি দেখছো না যে আল্লাহরই অনুগ্রহে সমুদ্র মধ্যে নৌযানগুলো পরিচালিত হয়-যেনো তিনি তোমাদেরকে স্বীয় নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। এবং যখন পর্বতসদৃশ তরঙ্গমালা তাদেরকে আবৃত করে, তখন তারা অল্লাহকে তাঁরই উদ্দেশ্যে বিনত হয়ে অকপটভাবে আহবান করে থাকে, অনন্তর যখন তিনি

তাদেরকে ভূমির দিকে উদ্ধার করেন, তখন তাদের কিয়দাংশ মধ্যপন্থা অবলম্বন করে এবং প্রত্যেক প্রবঞ্চক অবিশ্বাসী ব্যতীত কেউই আমার নির্দশনাবলী অস্বীকার করেনা।[১৫] পবিত্র আল কুরআনের এরূপ প্রতিটি আয়াত নৌযান ও নৌপথের ইঙ্গিত বহন করে।

নৌযানের পটভূমি

আরবরা সপ্তম শতকেই সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বাণিজ্য করত। অষ্টম শতকে মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয় এটাই নিশ্চিত করে। এছাড়া চৌদ্দ পনেরো শতকে ইউরোপীয়দের ভৌগোলিক আবিস্কারের কাহিনী সর্বজন বিদিত। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত সাধারণ মানুষ সমুদ্র ভয় করতো এবং বড় বড় গাছের গুড়ি দিয়ে বিল ঝিল ও নদী পার হতো। ১৯০৪ সালে বড় গাছের গুড়ি উপর থেকে কেটে ফাঁকা খোলসা করে ক্যাপ্টন দাস একটি নৌকা তৈরি করেন এবং সেটি নিয়ে বৃটিশ কলম্বিয়া আমেরিকা থেকে সারা বিশ্ব ভ্রমণে বের হন। তিন বছর পর তার এই ভ্রমণ শেষ হয়। এছাড়া দজলা নদীর মাঝি বড় একটি কাঠের উপর চামড়া বিছিয়ে নৌকা হিসেবে ব্যবহার করেন।[১৬] পৃথিবীর প্রথম নৌযান নির্মাণ করেন হযরত নুহ (আঃ)। এর দৈর্ঘ্য ছিল ৪৫০ ফুট, প্রস্থ ৭৫ ফুট এবং উচ্চতায় ৪৫ ফুট যা ১৫ হাজার টন ভারী ছিল।[১৭] খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে ফেনেকী জাতিও বহু বড় বড় নৌযান নির্মাণ করেন। এসব নৌযানে তারা কেবল ভূ-মধ্যসাগরের উপকূলবর্তী শহরগুলোতেই বাণিজ্য করতেন না, দক্ষিণে আফ্রিকা ও উত্তরে বহুদূর পর্যন্ত চলে যেতেন। ফেনেকী জাতির পূর্বে আটলান্টিক অঞ্চলের অধিবাসীরা জাহাজ নির্মাণও জাহাজ চালনার ক্ষেত্রে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। তাদের নৌঘাঁটি ছিলো ক্রীট দ্বীপে। তাদের পূর্বে কারথেগী নামক এক বিখ্যাত জাতি ছিলো। তারা জাহাজ নির্মাণ শিল্পে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। তাদের জাহাজগুলোতে আটটি করে দাঁড় ছিলো। তারা মালয় উপকূল পর্যন্ত নৌকা বাইচ দিতো। ঘন্টায় ৯ মাইল ছিল সেগুলোর গতিবেগ। কালের বিবর্তনে জাহাজ নির্মাণে লোহা ব্যবহৃত হয়। প্রথম লোহা ব্যবহার করা হয় ইরানী ও পিলেপিনোজের যুদ্ধে।[১৮] ইরানীরা প্রথম এ যুদ্ধে লোহার ব্যবহার করে। এসব জাহাজে শাসকগণ চলাফেরা করতেন। সাধারণ মানুষের যাতায়াত ও ব্যবসায় বাণিজ্যের জন্য এসব জাহাজ ব্যবহৃত হতো না।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মাধ্যমে ইসলামী সভ্যতার সূত্রপাত হলে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়। সিরিয়া ও মিশরে ইসলামের পতাকা উড্ডীন হলে এবং মুসলিমরা রোমানদের সাথে যুদ্ধে সমুদ্র যুদ্ধের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। হযরত ওমর (রাঃ) সময়ে ইসলামী সভ্যতা সবচেয়ে বেশী সম্প্রসারিত হয়। ইরানের উপকূলবর্তী এলাকা বাহরাইনে সৈন্য পরিচালনার জন্য পারস্য উপসাগরের নৌপথ ছাড়া বিকল্প উপায় ছিল না, তাই তিনি নৌপথেই সৈন্য পরিচালনা করেন। তার এই অভিযান ব্যর্থ হলে হযরত ওমর (রাঃ) তাকে বাহরাইন থেকে সরিয়ে কুফার সাদ ইবন আক্কাসের অধীনে ন্যস্ত করে দেন। খলিফা তখনও নৌবাহিনী গঠনের প্রতি গুরুত্ব দেননি।[১৯] ফলে খলিফা ওমরের সময়ে নৌবাহিনী গঠিত হয়নি।

উমাইয়া শাসন আমলে নৌবাহিনী

উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়া সিরিয়া ও পশ্চিম জর্ডান বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তিনি একজন উচ্চাভিলাষী দক্ষ বীর সেনাপতি। রোমান বাহিনীর সাথে তাঁর প্রায়ই মোকাবেলা করতে হতো। তাই তিনি খলিফা ওমর (রাঃ) নিকট নৌবাহিনী গঠনের জন্য অনুরোধ করেন এবং খলিফা মিসরের গভর্ণর আমর ইবনুল আসের নিকট সমুদ্র ভ্রমণ সম্পর্কে সঠিক তথ্য চেয়ে পত্র লেখেন। আমর ইবনুল আস সমুদ্রের অভিজ্ঞতা থেকে পত্রের উত্তর দেন যে, একটি ভাসমান কাষ্ঠখণ্ডের উপর

যেনো একটি পতঙ্গ উড়ে পড়ল। কাঠটি যদি উল্টে যায়, তাহলে পতঙ্গটি ডুবে যাবে। আর যদি কাঠটি সঠিকভাবে কিনারে পৌঁছায় তাহলে পতঙ্গটি স্ব-উল্লাসে উড়ে যাবে।'[২০] হযরত ওসমান (রাঃ) এর শাসনামলে মুয়াবিয়া এই বাহিনী গঠনের আবেদন করেন কিন্তু খলিফা এই শর্তে অনুমতি দেন যে, যারা সামুদ্রিক যুদ্ধে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করতে চাইবে তাদের নিতে পারবেন এবং জোর করে কাউকে বাধ্য করা যাবে না। আমীর মুয়াবিয়া মুসলিম নৌবাহিনী গড়ে তোলেন এবং পরীক্ষামূলকভাবে সাইপ্রাস দ্বীপে নৌ আক্রমণ করেন। সাইপ্রাসবাসীরা ৭২০০ স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে সন্ধি স্থাপন করে। এই প্রথম অভিযানে সফল হয়ে মুসলিম নৌবাহিনীকে[২১] আরো সুসংগঠিত ও মজবুত করা হয়। মুসলিমরা বন্দী রোমানদের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে নৌবাহিনীকে নতুন করে গঠন করেন, ফলে তাদের নৌশক্তি রোমানদেরকে ছাড়িয়ে যায়। মূলত প্রথমদিকে তারা রোমান নৌ-বন্দীদের এই কাজে নিয়োগ করতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রথম নৌযুদ্ধে অনেক রোমান জাহাজ মিস্ত্রী ও কাপ্তান মুসলিমদের হাতে বন্দী হয়েছিল। এই বন্দীরাই মুসলিমদের জন্য জাহাজ নির্মাণ করত, নৌসেনা তৈরী করত এবং রণপোতগুলোকে যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত করে তার ওপর মুসলিম ফোজের নও-জওয়ানদের আরোহণ শিক্ষা দিতো।[২২] মুয়াবিয়া সতেরোশ সশস্ত্র রণতরী রেখে যান এবং তাঁর পরবর্তীকালে মুসলিম বাহিনী আরো বেশি সম্প্রসারিত হয়। মুসলিমদের এই নৌ ঘাঁটি ছিল ভূমধ্যসাগরে। মুসলিম নৌবাহিনীতে সাধারণত সিরিয়া, আফ্রিকা ও স্পেনের মুসলিমগণ যোগদানের জন্য বেশী আগ্রহ দেখাতেন। এই সব দেশের মুসলিমগণ বড় বড় জাহাজ নির্মাণ কারখানা স্থাপন করেন। এসব কারখানাকে তারা 'তারাসানা' নামে অভিহিত করতেন। প্রতিটি কারখানায় জাহাজ নির্মাণের আসবারপত্র ও বিভিন্ন যন্ত্রাংশ তৈরী হতো। তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে বড় তারসানা নির্মিত হয়েছিল আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের শাসন আমলে তিউনিসে।[২৩] এই তারাসানা নির্মানের উদ্দেশ্য ছিল ভূমধ্যসাগর ও তার ছোট বড় দ্বীপগুলোকে মুসলিম শাসনাধীনে আনা। আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের[২৪] নির্দেশে আফ্রিকার গভর্ণর হাসান ইবনে নুমান তিউনিসের পোতাশ্রয়ে নৌযুদ্ধের বিভিন্ন জিসিনপত্র তৈরী ও মহড়া অনুষ্ঠিত করেন। অতি শিঘ্রই তিউনিস মুসলিমদের এক বৃহত্তম নৌকেন্দ্রে পরিণত হয়। এই নৌবহর মুসলিম উপকূলবর্তী অঞ্চলসমূহ এবং ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের নিরাপত্তা বিধান করতো।[২৫] উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিকের শাসনামলে মুসলিম নৌবহর পুনঃগঠনের প্রয়োজন দেখা দেয়। প্রথমত. মুসলিম অধিকৃত ভূমধ্যসাগরীয় আফ্রিকান উপকূল রক্ষার্থে নৌবহরের প্রয়োজন ছিল। কারণ নৌবহর পুনঃগঠন ব্যতীত আফ্রিকার উপকূল মুসলিম অধিকারে রাখা অসম্ভব ছিল। দ্বিতীয়ত. একদিকে রোমান নৌশক্তির মোকাবেলা করার প্রয়োজন অন্যদিকে ভূমধ্যসাগরের মেওরকা ও মানোরকা দ্বীপ দুটি দখল করা দরকার ছিল। কেননা উত্তর আফ্রিকার উপকূল অঞ্চলে রোমান বাহিনী বারবার হামলা করছিল। সারডিনিয়া ভূমধ্যসাগরের একটি বিখ্যাত দ্বীপ এবং মুসলিম নৌবাহিনী এই দ্বীপে হামলা করে বিনাযুদ্ধে তা দখল করে। একই সময়ে মুসলিম নৌবাহিনী ভূমধ্যসাগরের আরো কয়েকটি দ্বীপ দখল করে। খলিফা আল ওয়ালিদের শাসনামলে আফ্রিকার উপকূলে নতুন নতুন জাহাজ নির্মাণ কারখানা স্থাপিত হয়। এছাড়া মিশর ও সিরিয়ায় পুরাতন কারখানাগুলো পুনঃগঠিত হয়। খলিফা হিশামের শাসনামলে একশ সতেরো হিজরীতে ইবন আবী উবায়দার নেতৃত্বে বিভিন্ন দ্বীপে নৌ অভিযান প্রেরিত হয় এবং সফল হয়। শুধুমাত্র সাকারিয়া দ্বীপটি রোমানদের অধিকারে ছিল। মুসলিম নৌবাহিনী সমগ্র দ্বীপাঞ্চল দখল করে সেখানে সামরিক ছাউনি স্থাপন করে। এই সময়ে ইসলামের বিজয় পতাকা সদর্পে উড়তে থাকে এবং মুসলিম সেনাবাহিনী ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ও ভূমধ্যসাগরে সব সময় চক্কর দিতে থাকে।

আব্বাসীয় আমলে নৌবাহিনী

আব্বাসীয় আমলে মুসলিম সাম্রাজ্য আরো বেশি সম্প্রসারিত হয় ফলে মুসলিম দেশসমূহের নিরাপত্তা ও আইন শৃঙ্খলা বিধান করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছিল। তাই দেশের নিরাপত্তা ও শাসন ব্যবস্থার প্রতিই তাদের মনোযোগ নিবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। এই সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা ছিল সাকালিয়া বিজয়। খলিফা মামুনের রাজত্বকালে মুসলিম নৌবাহিনী সাকালিয়া আক্রমণ করে। সাকালিয়া পূর্বে মুসলিমদের অধিকারে ছিল। কিন্তু রোমানরা হামলা করে সেটি পুনরুদ্ধার করে। তখন সাকালিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন কনস্টানটাইন। সাকালিয়ার নৌ অধিনায়ক ছিলেন ফেমী এবং পরবর্তীতে ফেমীই সাকালিয়ার স্বাধীন সম্রাট ঘোষিত হন।[২৬] এই সময় আমীর যিয়াদাতুল্লাহ মুসলিম নৌযুদ্ধে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। আফ্রিকা থেকে তিনি আসাদ ইবনে ফুরাতের নেতৃত্বে ৩১২ হিজরীতে/৯২৭ সালে সাকালিয়ায় অভিযান চালান এবং ফেমীর শোচনীয় পরাজয় ঘটে। মুসলিম নৌবহর সারকাওসা অবরোধ করে অল্প দিনের মধ্যেই গোটা সাকালিয়ার ওপর মুসলিম প্রভুত্ব কায়েম করে। ভূমধ্যসাগরে মুসলিম নৌবহরের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পায়। সাকালিয়া বিজয়ের পর মুসলিম নৌবাহিনী অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপও অধিকার করেন।[২৭] মূলত আব্বাসীয় শাসকগণ তাদের নৌবহরকে নিয়ন্ত্রণে রেখে গৌরব ও মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখেন। কিন্তু আব্বসীয় শাসকদের দুর্বলতার সুযোগে তাদের বিশাল সাম্রাজ্য সেনানায়কদের মধ্যে বণ্টিত হয় এবং মুসলিম নৌবহর ও বিলীন হতে থাকে।

ইসলামের সম্প্রসারণের সাথে সাথে মুসলিমদের প্রত্যাশা বাড়তে থাকে। ভূমধ্যসাগরের সবচেয়ে বড় দ্বীপ সাকালিয়া মুসলিমরা দখল করতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়।[২৮] কিন্তু আঘলাবি বংশের (৮০০-৯০৯ খ্রি.) শাসক যিয়াদাত উল্লাহ আঘলাব (৮১৭-৮৪৩ খ্রি) এর শাসন আমলে সাকালিয়া দ্বীপটি মুসলিমদের অধিকারে আসে।[২৯] এই দ্বীপ দখলের পর মুসলিমরা মাল্টা, সার্ডিনিয়া, ক্রিট দ্বীপ থেকে ইজিয়ান সাগরের সকল দ্বীপে আক্রমণ চালায় এবং গ্রিসের উপকূলে আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে ব্যস্ত রাখত। এছাড়া এথেন্সে মুসলিম উপনিবেশ স্থাপিত হয়।[৩০] মোটকথা উমাইয়া ও আব্বাসীয় নৌশক্তিকে মোকাবেলা করার মতো আর কোন শক্তি অবশিষ্ট রইলো না। তখন মুসলিম বাহিনীর প্রধান ছিলেন আসাদ ইবন ফুরাদ। তিনি রোমান বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পর্যুদস্ত করেন। সময়ের পরিক্রমায় মুসলিমরা আফ্রিকা, স্পেন ও সিরিয়ায় অসংখ্য তারসানা (জাহাজ নির্মাণ কারখানা) প্রতিষ্ঠা করেন। তৃতীয় আব্দুর রহমান আল নাসিরের শাসনামলে শুধুমাত্র স্পেনেই দুইশটি বিরাট রণপোত বিদ্যমান ছিল। এবং স্পেনে বেশ কয়েকটি তারসানা/ জাহাজ নির্মাণ কারখানা গড়ে উঠেছিল।[৩১] প্রতিটি তারসানায়/ কারখানায় নিজস্ব উস্তল বা নৌবহর ছিল। প্রতিটি নৌবহরে (উস্তলে) একজন নৌপ্রধান থাকতেন। নৌপ্রধানগণ নৌবহরের অস্ত্রশস্ত্র ও নৌসেনাদের নিয়ন্ত্রণ করতেন আর সর্দারগণ রণপোতে পালতোলা ও তার পরিচালনার উপকরণ যোগান দিতো। ফাতেমীয় খলিফা আল মুইজের শাসনামলে নৌশক্তির উৎকর্ষ সাধিত হয়। এই সময়ে নৌসেনাদের সম্মান ও সুযোগ সুবিধা বাড়িয়ে দেয়া হয়। উল্লেখ্য যে, তাদের বেতন ছাড়াও জায়গীর প্রদান করা হতো। এইসব জায়গীরকে তারা 'গাযীদের আবওয়াব' নামে অভিহিত করতেন। বেতন ও জায়গীয় খলিফা নিজ হাতে বন্টন করতেন। এতে নৌ সদস্যরা বেশী সম্মানিতবোধ করতেন। খলিফা মুইজের শাসনামলে নৌ যুদ্ধ জাহাজের সংখ্যা ৬০০ হয়ে যায়। নৌযুদ্ধে প্রতিটি বিভাগের এক আলাদা দফতরও খোলা হয়েছিল। এই বিভাগের নাম ছিল 'দিওয়ানুল উস্তল'। নৌবাহিনীর সমস্ত খরচপত্র এই দিওয়ানই নির্বাহ করত। মুসলিম শাসন বিস্তারে মুসলিম নৌবাহিনীর ভূমিকা

ছিল অপরিসীম। মুসলিম শাসকগণ এই নৌবাহিনীর সাহায্যেই ভূমধ্যসাগরের বড় বড় দ্বীপাঞ্চল সার্ডিনিয়া, সিসিলী, মালটা, ক্রীট ও সাইপ্রাস প্রভৃতি অধিকার করেন। এছাড়াও বহু উপকূলীয় এলাকা মুসলিমদের দখলে আসে।[৩২] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মুসলিম নৌবহরসমূহ গোটা ভূমধ্যসাগর চক্কর দিয়ে বেড়াত এবং ইউরোপের উপকূলবর্তী এলাকায় যখন তখন হামলা করার ক্ষমতা রাখত। একথা বললে অতিরিক্ত হবেনা যে, মুসলিমরা গোটা ভূমধ্যসাগরের একচ্ছত্র মালিক হয়ে গিয়েছিল। তারা স্থলভাগের মতো জলভাগেরও সর্বাধিনায়ক হয়েছিল।

মুসলিম রণপোত কারখানা

আরব মুসলিমরা জাহাজ নির্মাণ কারখানাকে 'দারুলসানাআ' বলত। আধুনিক যুগের রণপোত শিল্পের জন্মদাতা হলো আরবরা। আধুনিক ইউরোপের অধিবাসীরা সিসিলী, স্পেন ও আফ্রিকার আরবদের নিকট থেকে এই শিক্ষা অর্জন করেছিল। ইতোপূর্বে (আরবদের পূর্বে) জাহাজ নির্মাতা ও জাহাজ চালক ছিল রোমানরা। তারা (রোমানরা) শুধু ছোট ছোট রণতরীই নির্মাণ করতে পারত। মুসলিমরা নতুন নতুন কৌশল আনয়ন করা ছাড়া নতুন নতুন মডেল ও কৌশল আবিষ্কার করে। মিশরের ফুসতাতে তারা প্রথম 'দারুসসানাআ' (কারখানা) প্রতিষ্ঠা করে। আহমদ ইবনে তুলুন এই কারখানার উন্নতি বিধানে আপ্রাণ চেষ্ঠা করেন। ফাতেমীয় শাসকগণের এটি 'ফুসতাত' থেকে মাকাসে স্থানান্তর করে আরো শ্রীবৃদ্ধি ও বিস্তৃতি দান করেন। নদনদী ও সাগর-মহাসাগরেই মুসলিমদের প্রকৃত রাজত্ব ছিল। মুসলিম রণতরী একদিকে যেমন দেশের প্রতিরক্ষা কাজে নিয়োজিত থাকতো, তেমনি তাদের বাণিজ্যতরীগুলো প্রাচ্য দেশসমূহের পণ্যসম্ভার বহন করে পাশ্চাত্য দেশসমূহে পৌঁছে দিতো।[৩৩] ফাতেমীয় খলিফারা দুই ধরনের জাহাজ নির্মাণ করেন। এক. যুদ্ধ জাহাজ যেগুলো 'উসতুল' বলা হতো। এই জাহাজে বিভিন্ন রণসম্ভার ও নৌসেনারা অবস্থান করত এবং যুদ্ধের সময় এটি ব্যবহার করা হতো। দুই. তেজারতী জাহাজ। এই জাহাজ দিয়ে এক দেশ থেকে অন্য দেশে পণ্যসামগ্রী আনানেয়া করতো। যা দ্বারা ব্যবসায় বাণিজ্য পরিচালনা করত। এগুলোকে বলা হতো নীলি জাহাজ। এই জাহাজগুলো তুলনামূলক ছোট ছিল। এবং ছোট নদনদীতে যাতায়াত করতে পারত। তৎকালীন সময়ে 'দারুসসানা'য় বিভিন্ন নামের বিভিন্ন রকম যুদ্ধ জাহাজ তৈরি হতো। এসব জাহাজের আকার আকৃতি ও গঠন প্রকৃতিও ছিল নানা রকম। এসবের সমষ্টিকে উসতুল বলা হতো। প্রসঙ্গক্রমে মুসলিমদের তৈরি কয়েকটি প্রধান যুদ্ধ জাহাজের নাম উল্লেখ করা হলো।

শূনা: এটি অনেক বড় জাহাজ ছিল এবং শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এই জাহাজে কিল্লা ও মিনার তৈরি করা হতো। হাররাকা: এই জাহাজগুলোতে মিনজানীক স্থাপন করা হতো। উল্লেখ্য যে মিনজানিক দ্বারা শত্রুর উপর বিস্ফোরক দ্রব্য নিক্ষেপ করা হতো। তাররাদা: এটি এক ধরণের দ্রুতগামী ছোট নৌকা। উশারিয়াত: এটি দ্বারা নৌসেনারা নীল নদে টহল দিয়ে বেড়াত। শালানদিয়াত: এটি এক ধরণের নৌকার মতো। এই ধরণের নৌকা দ্বারা বিভিন্ন খবর পৌঁছানো হতো। মিশতাহাত: সাধারণ যুদ্বের কাজে এই নৌকা ব্যবহার করা হতো। আরবদের জাহাজের আকার আকৃতি গ্রীক ও রোমান জঙ্গী জাহাজের মতো ছিল। কারণ তারা এই প্রযুক্তি রোমানদের কাছ থেকেই শিখেছে। উল্লেখ্য যে, আরব রণপোতগুলোতে নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হতো। এছাড়া যখন যে যুদ্ধাস্ত্র আবিস্কৃত হতো তাই দিয়ে নৌবাহিনীকে সজ্জিত করা হতো।[৩৪] প্রসঙ্গত বলা যায় যে আরবদের জাহাজ চামড়া, পশমী কাপড় দিয়ে মুড়ে দেয়া হতো এবং জাহাজ তৈরির সময় কাঠের সাথে এমন একটি জিনিস সেঁটে দেয়া হতো, যাতে সেগুলোতে আগুন না

লাগে। জাহাজে তারা আরোও উন্নত কৌশল ব্যবহার করত যেমন- যুদ্ধের সময় নিস্প্রদীপ মহড়ায় ব্যবস্থা করা হতো। হাঁস, মুরগী ও অন্য পশু জাহাজে রাখা হতো না। অধিক সতর্কতার জন্য জাহাজের ওপর নীল রঙের কাপড় ছড়িয়ে দেয়া হতো, যাতে শত্রুরা দূর থেকে জাহাজ দেখতে না পায়। তাছাড়া তারা তাদের নৌতরীর চারপাশে লোহার লম্বা, সূচালো লোহাখণ্ড লাগিয়ে রাখত যাতে শত্রু জাহাজ ঘেষা মাত্রই ফুটো হয়ে পানিতে ডুবে যায়।[৩৫] ইউরোপে বাস্প আবিস্কৃত হওয়ার সাথে সাথে নৌজাহাজে মুসলিমরা ব্যবহার শুরু করে।

মুসলিমদের দখলকৃত নৌবন্দর

খলিফা হযরত ওমর (রা:) সময়ে ইসলামের সম্প্রসারণ হয় সবচেয়ে বেশী। মুসলিমরা একদিকে পারস্য উপসাগর ও অপরদিকে সিরিয়া ও ফিলিস্তিন অতিক্রম করে আলেকজান্দ্রিয়া পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। ইরানের বিখ্যাত নৌকেন্দ্র ছিল পারস্য উপসাগরের উবাল্লা বন্দর। আর ভূমধ্যসাগরের আলেকজান্দ্রিয়া বন্দর ছিল রোমানদের নৌকেন্দ্র। উবাল্লা ছিল ইরানীদের সর্ববৃহৎ নৌকেন্দ্র। এখান থেকেই ইরানীদের বাণিজ্যতরীগুলো হিন্দুস্থান ও চীন দেশে যাতায়াত করত। একইভাবে রোমানদের বাণিজ্যতরীগুলোও আলেকজান্দ্রিয়া নৌবন্দর থেকে কনস্টানটিনোপল ও পশ্চিম আফ্রিকার বন্দরগুলো পর্যন্ত পৌঁছে যেতো।[৩৬] এই বিখ্যাত নৌকেন্দ্রই আরবদের দখল করে। মুসলিম নৌবাহিনী অধিকৃত নৌবন্দরগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

জার: এটি লোহিত সাগরের আরব উপকূলে য়ামবু বন্দরের কাছে অবস্থিত। ৭ম শতকে যে মুসলিম দলটি হাবশা (আবিসিনিয়া) থেকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। তারা এই বন্দরেই অবতরণ করেছিলেন। এই বন্দরটি প্রাক মুসলিম যুগ থেকেই সুপরিচিত ছিল এবং হযরত ওমর (রা:) এর সময়ে মিসর ও সিরিয়া বিজয়ের পর এর গুরুত্ব আরও বাড়তে থাকে।[৩৭] এছাড়া খাল কেটে নীল নদ ও লোহিত সাগরের মধ্যে সংযোগ সাধন করলে জার এর গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। পবিত্র ভূমি মদীনার জন্য চারপাশ থেকে বিভিন্ন মালামাল এসে এখানেই নামত এবং এখান থেকেই বাণিজ্য তরীগুলো মিসর, এডেন, হিন্দু ও চীনসহ বিভিন্ন দেশে যাতায়াত করত। জারের উল্টা দিকে সমুদ্রের মাঝখানে কারাফু নামের একটা দ্বীপ ছিল।[৩৮] এখানে লোকজন নৌকায় যাতায়াত করত। জারের মতো এই দ্বীপটিও মুসলিমদের অধিকারে ছিল এবং এখানে ব্যবসায় বাণিজ্য পরিচালিত হতো।

উবাল্লা: বসরা থেকে দূরে দজলা (টাইগ্রিস) নদীর তীরে সুপ্রাচীন ইরানের নৌবন্দর ছিল উবাল্লা। চর্তুদশ হিজরীতে এটি দখলের মাধ্যমেই মুসলিমরা পূর্ণরূপে ইরান দখল করতে সক্ষম হয়।[৩৯] এখানে চীন ও হিন্দুস্থানগামী জাহাজ থাকত। **বসরা:** হযরত ওমর (রা:) নির্দেশে কারণা ও শাতিল আরবের মধ্যে এই বন্দরটি নির্মিত হয়। ভৌগোলিক ও অবস্থানগত গুরুত্বের কারণে চীন ও ভারতবর্ষে গমণকারী জাহাজের কাছে এটি বিশিষ্ট কেন্দ্রে পরিণত হয়। এর দ্বারা সিন্ধু ও বসরার যোগাযোগ আরো ঘনিষ্ট হয়।

সীরাফ: এটি পারস্য উপসাগরে অবস্থিত এবং আরবের বাণিজ্য জাহাজগুলো চীন ও ভারতবর্ষে যাওয়ার সময় এই নৌবন্দর ব্যবহার করত। **এডেন:** ইয়েমেন উপকূলের বিখ্যাত এডেন। এই বন্দর দিয়ে হাবশা, মানদার, জেদ্দা, ভারত ও চীনের বাণিজ্য তরী যাতায়াত করত। এডেন খুবই প্রসিদ্ধ, জমজমাট ও মালামালে ভরপুর ছিল। **সুহার:** আম্মামের রাজধানী ও নৌবন্দর ছিল। ঐতিহাসিকদের মতে, বন্দরটি অত্যন্ত জৌলুসময়, বৈভবের প্রাচুর্য্য ও বর্ণাঢ্য বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। এটি গোটা সমুদ্র উপকূল জুড়ে বিস্তৃত।[৪০] সুউচ্চ ও সুরুচিময় ঘর, ইট ও শালকাঠ দ্বারা নির্মিত। এবং উপকূলে মিঠা পানির নহর প্রবাহিত।

জেদ্দাঃ এটি প্রাক মুসলিম যুগের বন্দর। আফ্রিকা, আবিসিনিয়া, সিন্ধু ও ইরানে ইসলামের সম্প্রসারণের সাথে সাথে জেদ্দার শ্রীবৃদ্ধি ঘটে।[৪১] বর্তমানে এটি হজ্জযাত্রীদের বন্দরে পরিণত হয়েছে। **শহর কুলযুমঃ** লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত এক বিরাট শহর ও নৌবন্দর ছিল। এটি খাদ্য সরবরাহের কেন্দ্ররূপে ব্যবহৃত হতো। যেসব বণিক মিসর থেকে হিজাজ ও ইয়েমেনে খাদ্যশস্য সরবরাহ করতেন। এই বন্দরটিই তাদের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিলো। এখানে বিভিন্ন দেশের বণিক ও সওদাগরেরা বসবাস করত। **ঈলাঃ** আকাবার পূর্বের নাম ঈলা এবং এটি সিরিয়ার সুপ্রসিদ্ধ নৌবন্দর। এটি লোহিত সাগরের পাড়ে সমৃদ্ধশালী শহর ছিলো। এখানে সিরিয়া, মিসর ও উত্তর আফ্রিকার বাণিজ্য তরী যাতায়াত করত। ঈলা ছিল হরেক রকম পণ্যদ্রব্যের বাণিজ্য কেন্দ্র। উত্তর আফ্রিকার হজ্জযাত্রীগণ এই বন্দরেই অবতরণ করে থাকে।

ভূমধ্যসাগর সিরিয়ার উপকূল থেকে উত্তর আফ্রিকার 'জাবাতুল তারিক' পর্যন্ত বিস্তৃত।[৪২] মুসলিমদের উপর রোমানদের আক্রমণের আশংকা লেগেই থাকত। এই কথা চিন্তা করেই মুসলিমরা সিরিয়ার উপকূলবর্তী 'সুর' নামক স্থানে জাহাজ নির্মাণ কারখানা স্থাপন করেন। আরবদের সমুদ্র বিজয় যতই বাড়ছিল রোমানরাও ততই পেছনে হাটছিল। উমাইয়া শাসনের পর আব্বাসীয়রা মুসলিম নৌশক্তির অধিকারী হয়। তাদের পর উত্তর আফ্রিকার অধিপতি হন উবায়দুল্লাহ আল মাহাদী। এছাড়া ফাতেমীয়দের রাজত্ব অনেক শক্তিশালী ছিল। তাদের রাজ্যসীমা সিসিলী, সিরিয়া ও মিসরের উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাদের বেশীর ভাগ পথই নৌনির্ভর ছিলো। এজন্যই তারা তিউনিসের পুরান নৌকারাখানা সমৃদ্ধ করে তোলে। মাসীনা, পালার্মো, বিজায়া, সাবতা, মাহদীয়া, তিউনিস, শহর রশীদ, শহর কাওস, দামিয়াত ও আলেকজান্দ্রিয়া[৪৩] বিখ্যাত নৌবন্দর ছিল।

নৌবাহিনী ও মুসলিম বাতিঘর

নৌবাহিনীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে থাকে বাতিঘর। পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন ও প্রথম বাতিঘর নির্মিত হয় আলেকজান্দ্রিয়ায়। বিপদজনক স্থানে এসব বাতিঘর নির্মাণ করা হতো। বড় বড় খাম্বা পুঁতে এই বাতিঘর নির্মাণ করা হতো। এসব বাতিঘরে বাতি জালোনোর জন্য কিছু লোক থাকত, এসব লোকের কাজ ছিল বাতি নিভে গেলে জালিয়ে দেয়া। এটি ২৭৫ ফুট উঁচু এবং আলেকজান্দ্রিয়ার নৌবন্দরের সন্মুখে দণ্ডায়মান। মুসলিম শাসনামলে এই বাতিঘরের অনুরূপ অনেক বাতিঘর নির্মাণ করা হয়। মূলত ইসলামের সম্প্রসারণের সাথে সাথে মুসলিমদের অধিকারে আসা নৌপথে অনেক বাতিঘর নির্মিত হয়। ইংল্যণ্ড, আমেরিকা ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশ মুসলিমদের কাছ থেকে এই বাতিঘরের ধারণা পেয়েছিল।[৪৪] প্রথমে তেল দিয়ে বাতি জ্বালানো হলেও পরবর্তীতে বিদ্যুৎ আবিস্কারের পর এসব বাতিঘরে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা

কোনো একটি গবেষণায় সামগ্রিক বিষয় তুলে ধরা সম্ভব নয়। আলোচ্য প্রবন্ধটি রচনায় মৌলিক উৎস হিসেবে শুধুমাত্র পবিত্র আল কুরআন এর সুরার অনূবাদ ব্যবহার করা হয়েছে। সমুদ্র ও জলসীমা সম্পর্কে হাদীসের তথ্য ব্যবহার করা হয়নি। নৌবাহিনীর শুরু থেকে আব্বাসীয় শাসন আমল পর্যন্ত নৌবাহিনীর কার্যক্রমের বর্ণনা সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে এবং পরবর্তী সময়ের শাসকবর্গের ভূমিকা এই আলোচনায় স্থান পায়নি। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক উৎস হাদীসের তথ্য সন্নিবেশিত করে অন্যান্য গবেষকদের জন্য জলসীমা ও নৌবাহিনী সম্পর্কে আরো বিস্তারিতভাবে গবেষণার সুযোগ রয়েছে।

উপসংহার

সবশেষে একথা বলা যায় যে, নৌবাহিনীকে বলা যায় একটি দেশের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি। যে দেশের নৌবাহিনী শক্তিশালী সেই দেশ জলসীমায় সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তির অধিকারী। কারণ নৌবাহিনী দ্বারা যেমন দেশের প্রতিরক্ষা জোরদার করা যায় তেমনি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শক্তিশালী হওয়ার উপায় তাদের হাতে রক্ষিত থাকে। বিশ্বের বড় বড় দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক ব্যবসায় বাণিজ্য নৌপথে পরিচালিত হয়। তাই এপথে বাণিজ্য জাহাজ যাতায়াতের জন্য তারা বাণিজ্য শুল্ক লাভের সুযোগ পায়। সমুদ্র বন্দর সুবিধা দখলদার বাহিনীর হাতেই থাকে, তাই নৌশক্তি প্রতিটি দেশের অর্থনৈতিক ভাগ্যও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। উমাইয়া ও আব্বাসীয়দের নৌবাহিনীও ঠিক আরব জাতির অর্থনৈতিক শক্তির উৎস ছিল। উমাইয়া ও আব্বাসীয় নৌবাহিনী যতদিন শক্তিশালী ছিল ততোদিন বাইজানটাইন রোমান বাহিনী আরবীয় মুসলিম বাহিনীকে বারবার আক্রমণ করেও দুর্বল করতে পারেনি। মুসলমানরা নতুন নতুন কৌশল প্রয়োগ করে রোমান নৌযানগুলোকে আঘাত করে ক্ষতিগ্রস্থ করায় তারা মুসলমানদের কাছে পরাজিত হয়েছে। বেশির ভাগ সময়ই জলরাশির সর্ববৃহ অংশ একমাত্র মুসলিমদের অধিকারে ছিল। নীল নদ, আরব সাগর, ভূমধ্যসাগর, পারস্য উপসাগরসহ অন্যান্য দ্বীপাঞ্চল মুসলিমদের দখলে ছিল। আলেকজান্দ্রিয়া নৌবন্দর, কনসটান্টিনোপল ও পশ্চিম আফ্রিকার বন্দরগুলোর মালিক ছিল মুসলমানগণ। পরবর্তীকালে মুসলিম শাসকদের দুর্বল শাসনে নৌশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে, ফলে এসব বন্দর ও দ্বীপগুলো ইউরোপীয় শাসকগণ দখল করে নেয়। এছাড়া মুসলিমদের বিভিন্ন জাহাজ নির্মাণ কারখানা, অস্ত্রাগার, নৌবাহিনীর নৌঘাঁটিগুলো তাদের অধিকারে চলে যায়। ভূমধ্যসাগর একমাত্র মুসলিমদের দখলে ছিল এবং তাদের নৌযান সব সময় এখানে প্রতিরক্ষা জোরদার করে রাখত ফলে মুসলিম নৌযানের ভীতিতে ইউরোপীয় জাহাজ দূরত্ব বজায় রাখত। সময়ের পরিক্রমায় পরবর্তীতে ভূমধ্যসাগরে ইসলামের পতাকার পরিবর্তে খ্রিষ্ঠানদের পতাকা উড়তে থাকে এবং তা এখনও বিদ্যমান।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ মফিজউল্লাহ কবির, *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ*, ঢাকা, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ, ২০০৯, পৃ. ৭৯; মুহাম্মদ রেজা-ই-করীম, *আরব জাতীর ইতিহাস*, ঢাকা, মেরিট ফেয়ার প্রকাশ, ২০১৪, পৃ.১০৭-১০৮

২ P.K.Hitti, *History of the Arabs,* Macmillans &co Ltd, New York st. martin press, 1958, pp. 193-194, pp. 158-160

৩ আল কুরআন, ইমদাদিয়া লাইব্রেরী, বাংলা অনুবাদ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ১২ পারা, সুরা হুদ, আয়াত- ৩৭

৪ ঐ, ২৭ পারার সুরা কামার, আয়াত-১৩

৫ ঐ, সূরা হুদ, আয়াত ৪২

৬ ঐ, সুরা শূরা, আয়াত, ৩২-৩৩, পারা,২৫

৭ ঐ, সুরা হজ্জ, আয়াত-৬৫

৮ আল কুরআন, সূরা ইবরাহীম, আয়াত, ৩২

৯ সূরা নূহ, আয়াত, ৪০

১০ সূরা আনকাবত, আয়াত ৬৫

১১ সুরা আন, আম, আয়াত ৬৩-৬৪

১২ সূরা আন আম, রুকু ১২, আয়াত, ৯৭

১৩ সূরা রুম, আয়াত ৪৬

১৪ সূরা ইয়াসীন ৪১ নং আয়াত

১৫ সূরা ইয়াসীন, আয়াত ৪১

১৬ লোকমান ৩১-৩২

১৭ পবিত্র আল কুরআনের সূরা নূহ সম্পন্ন, সূরা হুদ, ৩৭নং, ৪০ নং আয়াত

১৮ আবদুল্লাহ ওয়াহেদ সিন্ধী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ০৯

১৯ মুহাম্মদ রেজা-ই-করীম, *আরব জাতীর ইতিহাস*, ঢাকা, মেরিট ফেয়ার প্রকাশ, ২০১৪, পৃ.১০৭-১০৮

২০ আব্দুল ওয়াহেদ সিন্ধী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭

২১ P.K.Hitti, *History of the Arabs*, London, Macmillans &co Ltd, New York st. martin press, 1958, pp. 193-194

২২ আব্দুল ওয়াহেদ সিন্ধী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮

২৩ *পূর্বোক্ত*, পৃ.১৮

২৪ P.K.Hitti, *op. cit*, p. 226

২৫ মুহাম্মদ রেজা-ই-করীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭১-১৭২

২৬ মুহাম্মদ নূরুল আমীন, *বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান*, ঢাকা, আহসান পাবলিকেশন, ২০০২, পৃ. ২১০

২৭ *পূর্বোক্ত*, পৃ.২১০

২৮ P.K.Hitti, *op. cit*, pp. 618-619

২৯ মুহাম্মদ রেজা-ই-করীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৩

৩০ *পূর্বোক্ত*, পৃ.৩৫৩

৩১ সৈয়দ আমীর আলী, *এ শর্ট হিস্ট্রি অব্ দি স্যারাসিন*, অনুবাদ, প্রফেসর মোহাম্মদ নূরনবী, মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৯, পৃপৃ. ৩৫৭-৩৫৯ : আব্দুল ওয়াহেদ সিন্ধী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

৩২ মুহাম্মদ নূরুল আমীন, *বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান*, ঢাকা, আহসান পাবলিকেশন, ২০০২, পৃ. ২১০

৩৩ ওয়াহেদ সিন্ধী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৬

৩৪ মুহাম্মদ নূরুল আমীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২১২

৩৫ ওয়াহেদ সিন্ধী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৬-২৮

৩৬ P.K.Hitti, *op. cit*, pp. 161-165

৩৭ *Ibid*, p.158

৩৮ *Ibid*, pp. 150-154

৩৯ মুহাম্মদ রেজা-ই-করীম, *প্রাগুক্ত*, *পৃ.* ২৫৫

৪০ মুহাম্মদ নূরুল আমীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২১২

৪১ *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১৩

৪২ নুরুল হোসেন খন্দকার, *বিশ্বসভ্যতায় মুসলিম অবদান*, ঢাকা, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮, পৃ. ২৪৪-২৪৫

৪৩ *পূর্বোক্ত*

৪৪ P.K.Hitti, *op. cit*, pp. 166-168